The Dhaka University Journal of Linguistics: Vol. 17, No. 33-34, Published by the Registrar, University of Dhaka, ISSN 2075-3098, e-ISSN 2408-851X
DOI : http://dx.doi.org/10.70438/dujl/173334/0012

অ্যাকাডেমিক সংগঠক মুহম্মদ আবদুল হাই : ‘পাকিস্তান’ থেকে ‘বাংলাদেশ’

মো. রাফাত আলম মিশু*

Abstract: Muhammad Abdul Hai (1919-1969) is a prominent name in the academic arena of Bangladesh. He is known for many things, including research and practice in phonetics, writing essays and books on literature and culture, editing journals and books, being active in cultural activities, and being an intellectual. Hai's activity spanned almost the entire period of the Pakistan era. In the forties before and even after the establishment of Pakistan, he supported the idea of Pakistan. Under the Pakistan state structure, he worked on Bengali language and literature. He also tried to elevate Bengali language and literature to a higher level in the academic sphere through collective efforts. The collective practice of Bengali language and literature during the Pakistan era also has a cultural and political significance. The natural and rebellions role of Bengali language and literature is one of the elements that are considered important in the context of the establishment of Bangladesh as an independent and sovereign state in 1971. In the academic arena, Md. Abdul Hai played a leading role in this context. On the one hand, support for the idea of Pakistan, holding on to the state of Pakistan; and on the other, lifelong engagement with Bengali language and literature, passion for Tagore, opposition to various government decisions. Do these issues create a dual situation in Muhammad Abdul Hai, or are they interrelated and interdependent?—The answer to this question is sought in this article.

Keywords: Muhammad Abdul Hai, Language and literature of Bangladesh, Idea of Pakistan, Idea of Bangladesh, Cultural and political significance.

১. ভূমিকা

বাংলাদেশে বাংলা বিদ্যাচর্চা তথা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অ্যাকাডেমিক চর্চায় একজন পথিকৃৎ ব্যক্তিত্ব মুহম্মদ আবদুল হাই[১]। পড়া, পড়ানো, সম্পাদনা, গবেষণা প্রভৃতি অ্যাকাডেমিক বিষয়ে তিনি নিজে যেমন ছিলেন সক্রিয়, তেমনি পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে

---

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

অ্যাকাডেমিক চর্চার একটি অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে তাঁর তৎপরতা ওই পরিমণ্ডলে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হয়। আবদুল হাইয়ের এই সংক্রান্ত সাংগঠনিক তৎপরতাকে চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে তাঁর গবেষণা, বুদ্ধিবৃত্তিক অবস্থান – এই বিষয়গুলো প্রাসঙ্গিকভাবে এলেও সচেতনভাবে এখানে পঠন-পাঠন তথা শিক্ষাসংক্রান্ত অর্থে 'অ্যাকাডেমিক' শব্দটি নির্বাচন করা হয়েছে। একই সঙ্গে এই প্রবন্ধের শিরোনামে ব্যবহৃত আরও দুইটি শব্দ ব্যবহারের ব্যাখ্যা দেওয়া প্রয়োজন – 'পাকিস্তান' এবং 'বাংলাদেশ'। 'পাকিস্তান' বলতে কেবল 'রাষ্ট্র-পাকিস্তান'কে বোঝানো হয়নি; বরং পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অর্ধযুগ আগে থেকেই যে পাকিস্তান-আন্দোলন, সাহিত্যে স্বাতন্ত্র্যবাদী ধারা এবং ১৯৪৭-এর পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা, অতঃপর নতুন ধারার সাংস্কৃতিক অভিযাত্রা, ভাষা-প্রশ্ন ও ভাষাসংস্কার প্রশ্ন, ঢাকা-কেন্দ্রিক বাংলা সাহিত্য – এইসব ধারণার সমষ্টিকে বোঝানো হয়েছে। আর 'বাংলাদেশ' বলতে বোঝানো হয়েছে – যে ধারণাসমষ্টির ভিত্তিতে বাংলাদেশ-প্রতিষ্ঠা অনিবার্য হয়ে উঠেছিল – বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চা, অ্যাকাডেমিক চর্চা, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক লড়াই – তাকে; 'রাষ্ট্র-বাংলাদেশ'কে না। মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের ক্ষেত্রে এ বিষয়টি আরও স্পষ্ট যে, বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার দুই বছর আগেই দুর্ঘটনায় তাঁর অকাল-প্রয়াণ ঘটে।

প্রশ্ন হতে পারে – সাতচল্লিশপূর্বকালে মুহম্মদ আবদুল হাই কি পাকিস্তান-সমর্থক ছিলেন? এর সুপ্রচলিত এবং জাতীয়তাবাদী ধারার গ্রাহ্য উত্তর হলো – হ্যাঁ, বঙ্গপ্রদেশে বসবাসকারী অন্য প্রায় সকল শিক্ষিত মুসলমান বাংলাভাষীর মতো তিনিও আদর্শিকভাবে পাকিস্তান-ধারণার সমর্থক ছিলেন। এই পর্যন্ত উত্তরটা বেশ স্বস্তিকর। কিন্তু প্রশ্নটা যদি হয় – সাতচল্লিশ-পরবর্তীকালে, বিশেষত বায়ান্নর পরেও কি তিনি পাকিস্তান-ধারণার মধ্যে অবস্থান করেছেন, তখনই উত্তরের মাত্রাগত বৈচিত্র্য ও একাধিক সমীকরণ তৈরি হয়। একাত্তর-পরবর্তী বাস্তবতায় অনেকক্ষেত্রে রাষ্ট্র-পাকিস্তান বা পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর অগণতান্ত্রিক ও বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে পূর্ববাংলার মানুষের প্রতিবাদ-প্রতিরোধের সহজাত, স্বাভাবিক ও অনিবার্য তৎপরতাকে একসময়ের বহুকাঙ্ক্ষিত 'পাকিস্তান-ধারণা'র বিপ্রতীপ তৎপরতা হিসেবে একাকার করে ফেলা হয়। বর্তমান আলোচনার প্রশ্ন ও লক্ষ্য হচ্ছে – সমসাময়িক অন্যদের মতো মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের ক্ষেত্রে 'পাকিস্তান-ধারণা'র সঙ্গে 'বাংলাদেশ-ধারণা' কি সম্পূর্ণত বিরোধমূলক, নাকি পরস্পর-সম্পর্কিত? এই উত্তর অনুসন্ধানের অনুষঙ্গ হিসেবে অ্যাকাডেমিক সংগঠক মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের কর্ম, সৃজন ও তৎপরতা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

১৯৪৭-এর অব্যবহিত-পরবর্তী ঢাকা-কেন্দ্রিক বাংলা সাহিত্যকে অনেক সাহিত্যসমালোচক এক নিমেষে পরিচিহ্নিত করেন 'পাকিস্তানবাদী সাহিত্য' হিসেবে। এই পরিচিহ্নায়ন একমাত্রিক। উক্ত সময়-পর্বে রচিত সাহিত্যে বহু আন্দোলন-সংগ্রামের

ফসল হিসেবে প্রাপ্ত পাকিস্তানের প্রতি মুগ্ধতা ও প্রত্যাশার উপস্থিতি পাওয়া যায়; কিন্তু সে-সাহিত্য বাংলা সাহিত্যই। ওই সাহিত্যধারার উত্তরাধিকার বর্তমান বাংলাদেশের সাহিত্য। তাই ‘বাংলাদেশের সাহিত্যে’র ইতিহাসের হিসাব যে ১৯৪৭ সাল থেকে শুরু হয় – এ নিয়ে কোনো পর্বেই কারোর মধ্যে বিশেষ দ্বিমত দেখা যায় না। ১৯৪৭, বাংলাদেশের অপরাপর বিবিধ বিষয়ের মতো, সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে একটি দিকচিহ্নিত সময়। অখণ্ড ‘বাংলা-দেশ’ ধারণা যেমন এই ঘটনাক্রমের মধ্য দিয়ে পরিবর্তিত হয়, তেমনি সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক পরিসরে ঘটে গুণগত পরিবর্তন। ক্রমপরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এরপর দুই যুগের যে অভিযাত্রা, তারই উত্তরাধিকার ১৯৭১-পরবর্তী স্বাধীন বাংলাদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতির ধারা। ১৯৭১ সালে এই জনাঞ্চলে রাজনৈতিকভাবে রাষ্ট্র হিসেবে বর্জিত হয় পাকিস্তান। কিন্তু ঢাকাকে কেন্দ্র করে বিকশিত দুই যুগের পূর্ব-পাকিস্তানি সাহিত্য ও সংস্কৃতিই পরম্পরাগত কারণে স্বাধীন বাংলাদেশে সাদরে গৃহীত হয়েছে; এই গ্রহণে কোনো বিরোধ তৈরি হয়নি।

২. অ্যাকাডেমিক সংযুক্তি

পাকিস্তান-পর্বের চব্বিশ বছরের মধ্যে অন্তত বিশ বছর (১৯৪৯-১৯৬৯) অ্যাকাডেমিক পরিচয়ের দিক থেকে মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের সক্রিয়তার কাল। ১৯৪৯ সালে তাঁর প্রধান কর্মক্ষেত্র বাংলা বিভাগে যোগদান থেকে শুরু করে ১৯৬৯ সাল তথা মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে ও পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর এই অ্যাকাডেমিক সক্রিয়তাকে শনাক্ত করা যায়। সংগঠক হিসেবে মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের সক্রিয়তা ও তৎপরতার একটি দীর্ঘ তালিকা তৈরি করা সম্ভব। তাঁর জীবনীকার আজহারউদ্দীন খান্ (১৯৭৬ : ২৫-২৬), মনসুর মুসা (২০২৩ : ১৯০-২১৭) *মুহম্মদ আবদুল হাই রচনাবলী*র (৩ খণ্ড : ১৯৯৪) সম্পাদক হুমায়ুন আজাদ, মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের স্মারকগ্রন্থে (মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ২০০০; সাখাওয়াৎ আনসারী ২০২৪ : ৩৭২-৩৮১) এবং তাঁকে নিয়ে সমসাময়িকদের স্মৃতিকথা ও দালিলিক উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে অ্যাকাডেমিক ব্যক্তিত্ব মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের উল্লেখযোগ্য সংযুক্তির (affiliation) কথা জানা যায়। যেমনঃ বাংলা একাডেমির আজীবন সদস্য; বাংলা একাডেমির কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য; কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের পরিচালনা সভা ও কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য; কেন্দ্রীয় লেখক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য; ভারতবর্ষের Linguistic Society of India-র আজীবন সদস্য; ফ্রাঙ্কলিন পাবলিকেশন্সের উদ্যোগে বাংলা বিশ্বকোষ সম্পাদনায় উপদেষ্টা সমিতির সদস্য; পাকিস্তান এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য; District Gazetteer প্রণয়নে পূর্ব-পাকিস্তান সরকার কর্তৃক গঠিত উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য; আন্তর্জাতিক P. E. N. ক্লাবের সদস্য; Linguistic Research Group of Pakistan সংস্থার সদস্য; East Pakistan School Text Book Board-এর উপদেষ্টা

পরিষদের সদস্য; পাকিস্তান আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় বোর্ডের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্ব; দাউদ ও আদমজী সাহিত্য পুরস্কারের উপদেষ্টা সমিতির সদস্য; চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের উন্নয়ন কমিটির সদস্য; ঢাকা মিউজিয়াম কমিটির সদস্য; Linguistic Society of America-র সদস্য।

সক্রিয়তা ও তৎপরতার ভিত্তিতে মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো হলোঃ মানবেন্দ্রনাথ রায়ের লেখা *The Historical Role of Islam* বইয়ের অনুবাদ হিসেবে *ইসলামের ঐতিহাসিক অবদান* প্রকাশ (১৯৪৯); লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব ওরিয়েন্টাল অ্যান্ড আফ্রিকান স্টাডিজে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের জন্য বিলেত-যাত্রা (১৯৫০); ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের অধ্যক্ষ (বিভাগীয় প্রধান) হিসেবে নিযুক্তিলাভ (১৬ নভেম্বর ১৯৫৪), যে দায়িত্ব তিনি মৃত্যু-দিন পর্যন্ত (৩ জুন ১৯৬৯) পালন করেন; উক্ত বিভাগ থেকে গবেষণা-পত্রিকা *সাহিত্য পত্রিকা* প্রকাশ (১৯৫৭), আমৃত্যু যেটির সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন; রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিক অনুষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন (১৯৬১); করাচির জামেয়া মিল্লায়ায় সেমিনার হলে প্রবন্ধপাঠ ও ইকবাল একাডেমিতে বক্তৃতা (১৯৬৩); 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহে'র আয়োজন (১৯৬৩); বাংলা একাডেমি কর্তৃক গঠিত 'বানান সংস্কার উপসঙ্ঘ'র সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন (১৯৬৩); ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গঠিত 'বাংলা ভাষা-সংস্কার ও সরলীকরণ' কমিটির সদস্য (১৯৬৭); রেডিওতে রবীন্দ্রসংগীত প্রচার বন্ধের সরকারি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে 'আঠারোজন বুদ্ধিজীবীর বিবৃতি'দাতাদের একজন (১৯৬৭); ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক গৃহীত 'বাংলা ভাষা-সংস্কার ও সরলীকরণ' প্রস্তাবের বিরোধিতা করে 'ভিন্নমতপোষক টীকা' প্রচার (১৯৬৮); উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রবন্ধ ও বই প্রকাশ ছাড়াও বাংলা সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক বই সম্পাদনা ও প্রকাশ।

সংযুক্তি, সক্রিয়তা ও তৎপরতার এই ঘটনাপুঞ্জ থেকে কোন বিষয়গুলো 'পাকিস্তানবাদী' আর কোনগুলো বাংলা-সাপেক্ষ হওয়ার কারণে পাকিস্তানবিরোধী, তা আলাদা করা মুশকিল; এক অর্থে অসম্ভব। কারণ স্বয়ং মুহম্মদ আবদুল হাই কোনো পরস্পরবিরোধী দ্বিমূলক (binary) অবস্থান থেকে এতগুলো বিষয়গুলোর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। পাকিস্তানের স্বতন্ত্র ভৌগোলিক পরিচয়ে অপরাপর ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর মতো পাকিস্তান রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক বাস্তবতার মধ্যে অবস্থান করেই তিনি এই সক্রিয়তা অব্যাহত রাখেন। পাকিস্তানের মতো একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোতে নিজ ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির উৎকর্ষ সাধনের জন্য তাঁর এ ধরনের সক্রিয়তা ছাড়া হয়তো অন্য কোনো উপায়ও ছিল না। ফলে নিজের জনাঞ্চলের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ, গবেষণা এবং বাংলা ভাষা-বিরোধী সরকারি তৎপরতার বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণের ক্ষেত্রে পাকিস্তান রাষ্ট্রকে অস্বীকার বা বৃহত্তর অর্থে 'পাকিস্তান-ধারণা' থেকে তাঁর সরে আসার কোনো

প্রয়োজন পড়ে না। বরং অ্যাকাডেমিক কর্তব্যজ্ঞান থেকে তিনি সরকারি এইসব সিদ্ধান্তের বিষয়ে প্রতিবাদী ভূমিকা পালন করেন। মূলত ষাটের দশকে রাষ্ট্র ও জনতার মধ্যকার ক্ষমতাকাঠামোর সম্পর্কসূত্রে সরকারের বিভিন্ন অবস্থানের বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের পরিসর তৈরি হয়েছিল। মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের অ্যাকাডেমিক ভূমিকাকে ষাটের দশকের বিশেষ পরিসরে স্থাপন করলে এর মধ্যে মাত্রাগত বৈচিত্র্য তৈরি হয়। তাঁর অ্যাকাডেমিক কাজগুলো বিবেচিত হতে থাকে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ভূমিকা হিসেবে। অর্থাৎ এখানে সময় ও পরিপার্শ্বের অনুষঙ্গ গুরুত্বপূর্ণ।

একই বছরের চারটি ঘটনাকে পাশাপাশি সাজিয়ে বিষয়টিকে আরও স্পষ্ট করা যেতে পারে। ১৯৬৭ সালে পূর্ব-পাকিস্তান স্কুল টেক্সটবোর্ড কর্তৃক গঠিত বাংলা প্রতিবর্ণীকরণবিধি প্রণয়নসংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন মুহম্মদ আবদুল হাই। ২৮শে মার্চ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গঠিত 'বাংলা ভাষা-সংস্কার ও সরলীকরণ'-এর এগারো সদস্যবিশিষ্ট কমিটিতে দায়িত্ব পালন করেন তিনি। ২৫শে জুন পাকিস্তান বেতার থেকে রবীন্দ্রসংগীত প্রচার বন্ধের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ হিসেবে জাতীয় সংবাদপত্রে যে 'আঠারোজন বুদ্ধিজীবীর বিবৃতি' প্রচার করা হয়, তিনি ছিলেন তাঁদের একজন। এরপর ১৭ ও ১৮ই জুলাই লাহোরে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান সাইক্লিং ফেডারেশনের সভায় তিনি পূর্ব-পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব করেন। তিনি ছিলেন পূর্ব-পাকিস্তান শৌখিন সাইকেল পরিচালনা সংসদের সাম্মানিক সভাপতি। উল্লিখিত চারটি ঘটনার প্রথম দুইটি ঘটনার পর তৃতীয় ঘটনাটিকে মনে হয় ভিন্নমাত্রিক; এবং তৃতীয় ঘটনার পর চতুর্থ ঘটনাটিকে মনে হতে পারে খাপছাড়া। কিন্তু ঘটনাগুলো বিরোধহীনভাবে আবদুল হাইয়ের জীবনে ঘটেছে; ওই কালের বাস্তবতার ভেতরে স্বাভাবিকভাবে ঘটেছে। আবার 'বাংলা ভাষা-সংস্কার ও সরলীকরণ' কমিটির সদস্য হওয়ার পরেও সকল সিদ্ধান্তের সঙ্গে মিলতে না পেরে তাঁর কাছে অযৌক্তিক বিবেচিত হওয়ায় মুহম্মদ এনামুল হক ও মুনীর চৌধুরীর সঙ্গে 'ভিন্নমতপোষক টীকা' প্রচার করতেও তিনি দ্বিধা করেননি। যে-কোনো ঘটনা মূলত বাস্তবতার পাটাতনেই সৃজিত হয় – ভবিষ্যতে তা ভুল বা ঠিক যেভাবেই প্রমাণিত হোক না কেন। আবদুল হাইয়ের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে বলা যায়, সাংগঠনিক তৎপরতায় তিনি ছিলেন বাস্তববাদী (Pragmatic)।

৩. রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে মুহম্মদ আবদুল হাই

বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য আন্দোলনের সঙ্গেও জড়িত ছিলেন মুহম্মদ আবদুল হাই (আজহারউদ্দীন ১৯৭৬ : ১২); যেমনটি চল্লিশের দশকে পাকিস্তান-সমর্থক আরও অনেক মুসলমান বাংলাভাষী যৌক্তিক কারণে রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে বাংলার পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন। এক অর্থে পাকিস্তান আন্দোলনের সমর্থকগোষ্ঠীর 'সেট'টিই ১৯৪৭-১৯৪৮-এ রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সূচনাপর্বে বাংলা ভাষার পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে।

তবে মোহাম্মদ আজম (২০২২ : ১২৪) জানিয়েছেন: ‘ভাষা আন্দোলনের সময়ে মুহম্মদ আবদুল হাই ইংল্যান্ডে ছিলেন, আর ফিরে আসার পরেও এ ব্যাপারে অন্তত লিখিত আকারে কোনো উল্লেখযোগ্য লিপ্ততা দেখাননি।’ তথাপি, আজহারউদ্দীনের মন্তব্য অনুযায়ী এ আন্দোলনের প্রতি মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের সমর্থন ভাষা আন্দোলনের প্রথম পর্বের (১৯৪৭-১৯৪৮) ক্ষেত্রে বিবেচনা করা যেতে পারে। প্রথমপর্বে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার আন্দোলনের প্রতি সমর্থন আর পাকিস্তান রাষ্ট্র-ধারণা পরস্পরবিরোধীও ছিল না। বরং পূর্ববাংলার স্বতন্ত্র বাংলা ভাষা তথা মুসলমানি উপাদানকে স্বীকার করে নেওয়া সংস্কারমূলক বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে ছিল এই সমর্থন। মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের ভাষাচিন্তার মধ্যে সেই সমন্বয়বোধ ছিল। ‘তিনি পশ্চিম বাঙলার বাঙলা ভাষার হিন্দুকরণ যেমন স্বীকার করেন নি, তেমনি পাকিস্তানে বাঙলা ভাষার ইসলামিকরণও মানেন নি।’ (হুমায়ুন ১৯৯৪/১ : বারো)। ‘ভাষা-সংস্কার ও মুসলমানি শব্দের আমদানির ব্যাপারে মুহম্মদ আবদুল হাই নমনীয়, উদারনৈতিক এবং যৌক্তিক সমঝোতা করার পক্ষপাতী ছিলেন।’ (মোহাম্মদ আজম ২০২১ : ১২৭)। উল্লেখ্য, চিরায়ত বাংলা বা অখণ্ড বাংলা তথা ‘হিন্দু-মুসলমানের সমন্বিত বাংলা’র কথা ভেবে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার বিষয়টি উত্থাপিত হয়নি। (মো. রাফাত ২০২৩ ১৪৫)। মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের রচনা (১৯৯৪/১ : ৪৮৮) থেকে উদ্ধৃত করা যাক:

> আমরা যখন পাকিস্তান অর্জনে সফলকাম হয়েছি তখন পূর্ব পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ বাংলাভাষা ও সাহিত্যে পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। তার জন্য আস্‌ফালনের প্রয়োজন নেই, ভাষাকে আজই ঢেলে সাজাবার তাগিদ নেই আর বাংলা বর্ণমালাকে গঙ্গা পার করে পশ্চিম বাংলার ‘কুফরস্থানে’ ঠেলে দিয়ে হুরুফুল কোরাণের ভাঁওতায় উর্দু অক্ষর গ্রহণ করারও ‘জরুরত’ নেই। পাকিস্তান রাষ্ট্রের উন্নতির সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা সাহিত্যও ধীরে ধীরে পাকিস্তানী (পূর্ব পাকিস্তানী অবশ্য [সম্পাদকের মন্তব্য]) ছাপ বহন করবে। (‘আমাদের ভাষা ও সাহিত্য’, *সাহিত্য ও সংস্কৃতি*, ১৯৫৪)

পাকিস্তানসৃষ্টি-পরবর্তী বাস্তবতায় রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রয়োজন থেকে রাষ্ট্রভাষার হিসেবে বাংলাকে পাকিস্তানি আদর্শের পরিসরে যাঁরা দাবি করেছিলেন, তাঁদের সঙ্গে মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের অ্যাকাডেমিক কর্মসংযুক্তির বড় ধরনের বিরোধ দেখা যায় না।

৪. পুস্তক-রচনা, গবেষণা ও সম্পাদনা

মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অ্যাকাডেমিক অবদান হলো বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগ থেকে বাংলাবিদ্যা চর্চার গবেষণা-পত্রিকা *সাহিত্য পত্রিকা*র সম্পাদনা ও প্রকাশ। ‘বারো বছর ধ’রে সম্পাদনা ক’রে এটিকে প্রতিষ্ঠিত করেন একটি অসাধারণ গবেষণাপত্রিকারূপে, তাঁর সম্পাদনাকালে যা ছিলো বাঙলা ভাষাঞ্চলে অদ্বিতীয়।’ (হুমায়ুন ১৯৯৪/১ : ছয়)। এ পত্রিকার উদ্দেশ্য সম্পর্কে শুরুর বেশ কয়েকটি সংখ্যায় ‘সাহিত্য পত্রিকা সম্পর্কে জ্ঞাতব্য’ অংশে উল্লেখ করা হয়: ‘সাহিত্য পত্রিকায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্য এবং এ দেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্পর্কিত গবেষণামূলক লেখা থাকবে।

যাঁরা এই উদ্দেশ্যে আত্মনিয়োগ করেছেন তাঁদের শ্রেষ্ঠ রচনা এ পত্রিকায় গৃহীত হইবে।' (মুহম্মদ আবদুল হাই ১৩৬৪)। স্পষ্টত বোঝা যাচ্ছে 'এ দেশ' বলতে পূর্ব-পাকিস্তানকে নির্দেশ করা হচ্ছে, যা বর্তমানের বাংলাদেশ। পাকিস্তান অংশ থেকে যেমন ইব্রাহীম খাঁ, মুহম্মদ এনামুল হক, মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ্, সৈয়দ আলী আহসান প্রমুখ এবং ভারতের বিশেষত পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন পত্রিকা ও বিদ্বৎমহল থেকেও (যেমন: শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অমলেন্দু বসু, আশুতোষ ভট্টাচার্য প্রমুখ) এ পত্রিকার গুরুত্ব সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসাবাণী পাওয়া যায়, যেগুলো ধারাবাহিকভাবে পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়। দুইটি দৃষ্টান্ত:

১. এমন সুসম্পাদিত মূল্যবান প্রবন্ধ-সম্বলিত সাহিত্য-পত্রিকা পশ্চিমবঙ্গ হইতে একটিও প্রকাশিত হয়না। বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে যাঁহাদের বিন্দুমাত্র মমতা আছে, তাঁহারা অচিরাৎ এই পত্রিকা সংগ্রহ করিবেন। – শনিবারের চিঠি, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৫ (উদ্ধৃত, মুহম্মদ আবদুল হাই ১৩৬৫)

২. প্রতিটি প্রবন্ধে নিষ্ঠা, শ্রম ও সততার স্বাক্ষর রয়েছে। সাহিত্য পত্রিকার মত serious পত্রিকার প্রয়োজন সকল সাহিত্যে। সাহিত্য পত্রিকাকে আমরা অভিনন্দন জানাই। (দেশ, ১৩ই ভাদ্র ১৩৬৫, ৩০ অগাষ্ট ১৯৫৮) (উদ্ধৃত, আজহারউদ্দীন ১৯৭৬ : ৮৫)

উল্লেখ্য, *সাহিত্য পত্রিকা* প্রকাশিত হয় তৎকালীন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর উদ্যোগে পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক সহযোগিতার মাধ্যমে – এই তথ্য এ পত্রিকার প্রথম সংখ্যার 'কৃতজ্ঞতা স্বীকার'[৩] অংশে উল্লেখ করা হয়। মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের *সাহিত্য পত্রিকায়* যেসব গবেষণা-প্রবন্ধ – বিশেষত প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যকে আবিষ্কার ও নতুন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার – বড় জায়গাজুড়ে আছে, সেগুলোর বিষয়-বক্তব্য পূর্ব-পাকিস্তানসাপেক্ষ; কেবল অখণ্ড বঙ্গ ও বাংলা-সাপেক্ষ নয়।[৪] কারণ সাতচল্লিশ-পূর্ববর্তী অখণ্ড বাংলার কাল-পরিসরে পূর্ব-পাকিস্তান অংশের যে বিষয়গুলো ছিল আলোচনার বাইরে, পাঠকের কাছে অনালোকিত, সেগুলোই প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতির মধ্য দিয়ে মুহম্মদ আবদুল হাই অ্যাকাডেমিক পরিসরে উপস্থাপন করেন। ফলে তাঁর এই প্রবণতা চল্লিশের দশকে সৃষ্ট পাকিস্তান-ধারণা থেকে দূরবর্তী নয়; বরং অনুগামী। স্বাতন্ত্র্যবাদী ধারার বাংলা সাহিত্যের উদ্যোক্তাদের কথা ছিল – 'বাংলা সাহিত্য জাতীয় সাহিত্য নয়, হিন্দু সাহিত্য। ... মুসলমানের সাহিত্য মুসলমানকেই রচনা করিতে হইবে।' (উদ্ধৃত, হুমায়ুন ২০১৪ : ১৮)। ১৯৪২ সালে আবুল মনসুর আহমদ তাঁর 'সাহিত্যে সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য' প্রবন্ধে বলেন: 'রাজনীতিতে পাকিস্তান সম্ভব-অসম্ভব ও আবশ্যক-অনাবশ্যক দুই-ই হইতে পারে, কিন্তু সাহিত্যে পাকিস্তান শুধু সম্ভব নয় – স্বাভাবিক এবং দরকারী।'[৫] বাঙালি মুসলমানদের যে ভাষায় সাহিত্য চর্চা করা উচিত, তিনি তার স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে বলেন: 'সেটা হবে বাঙ্গালী মুসলমানের মাতৃভাষা – হিন্দুর মাতৃভাষা নয়।' (আবুল মনসুর ১৩৪৯)। স্পষ্টত এখানে সম্ভাব্য পাকিস্তানে বাংলা ভাষা-সাহিত্য ও সংস্কৃতির একটি

স্বাতন্ত্র্যমূলক পরিচয় নির্ধারণের প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায়। এই আন্দোলন-সূচনার দুই দশক পরে সম্ভাব্য থেকে সম্ভবপর পাকিস্তান রাষ্ট্রের আওতায় মুহম্মদ আবদুল হাই তাঁর অ্যাকাডেমিক সাংগঠনিক তৎপরতার মধ্য দিয়ে সেই 'স্বাভাবিক ও দরকারী' কাজটি বাস্তবায়ন করেন। তবে আবদুল হাইয়ের দৃষ্টিভঙ্গি চল্লিশের দশকের আবুল মনসুরের হুবহু অনুকরণ নয়; বরং সময় ও পরিস্থিতিগত কারণে তাঁর অবস্থান স্বতন্ত্র।

অ্যাকাডেমিক প্রয়োজনে মুহম্মদ আবদুল হাইকে বাংলা সাহিত্যের বেশ কিছু ক্লাসিক বই সম্পাদনা ও প্রকাশ করতে হয়েছে। তাঁর শিক্ষাদান-পর্বে বাংলা বিভাগের পাঠক্রমভুক্ত বইয়ের জন্য, বিশেষত প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যের বইয়ের জন্য, অনেকটাই নির্ভরশীল থাকতে হয় পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রকাশিত বইয়ের ওপর। কিন্তু পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর ভারতবিরোধী অবস্থান, বিশেষত ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের পর যে প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি হয় তাতে পশ্চিমবঙ্গের বই ঢাকায় দুর্লভ হয়ে দাঁড়ায়। আবদুল হাই ১৯৬৬ সালের ২৭শে জুলাই এক চিঠিতে পশ্চিমবঙ্গে বসবাসরত তাঁর সুহৃদ আজহারউদ্দীন খানকে জানান: 'আমরা তো দুই দেশের কালো মেঘের পূর্ব পর্যন্ত আপনাদের ওধারের বই পুস্তক পেতাম – এখন পাইনে। আমাদের এধারের কোন বইই আপনাদের ওধারে নেওয়া হতো না।' (আজহারউদ্দীন ১৯৭৬ : ৩)। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের বইয়ের অভাব মোচনে বই প্রকাশের বিষয়টিও সহজ ছিল না পাকিস্তান-পর্বের ওই বিরুদ্ধ পরিবেশে। তাই বুদ্ধিমত্তা ও খানিকটা কৌশলের আশ্রয় নিয়ে 'হিন্দু চিহ্ন' এড়িয়ে তিনি বেশ কিছু বই সম্পাদনা করেন। যেমন: বৈষ্ণব পদাবলির সঙ্গে আরও কিছু পদাবলি-সাহিত্যের সংযোজন ঘটিয়ে আহমদ শরীফের সঙ্গে *মধ্যযুগের বাংলা গীতিকবিতা* (১৯৬১) নামে বই প্রকাশ করেন তিনি। পাক-ভারত যুদ্ধের পর তিনি আনোয়ার পাশার সঙ্গে যৌথ সম্পাদনায় *শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন*কে *বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্য* (১৯৬৭) এবং চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের একাংশ *কালকেতু উপাখ্যান* (১৯৬৭), অন্নদামঙ্গল কাব্যের একাংশ *মানসিংহ-ভবানন্দ* উপাখ্যান (১৯৬৭) নামে প্রকাশ করেন। এছাড়াও তিনি আনোয়ার পাশার সহযোগে *চর্যাগীতিকা* (১৯৬৮), আনিসুজ্জামানের সহযোগে *বিদ্যাসাগর রচনাসগ্রহ* (১৯৬৮) ও *দীনবন্ধু-রচনাসংগ্রহ* (১৯৬৮) ইত্যাদি বেশ কিছু দরকারি বই সম্পাদনা করেন এবং ঢাকা থেকে প্রকাশ করেন। এগুলোকে মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের অ্যাকাডেমিক দক্ষতা হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের অ্যাকাডেমিক সক্রিয়তার আরেকটি দিক উচ্চতর গবেষণায় তরুণ গবেষকদের উদ্বুদ্ধকরণ এবং বেশ কয়েকজন পিএইচডি গবেষকের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন। তাঁর তত্ত্বাবধানে পাঁচজন গবেষক ডিগ্রিপ্রাপ্ত হয়েছেন; আরও কয়েকজন গবেষণারত ছিলেন[৬] (রাফাত ২০২১)। কিন্তু অকাল প্রয়াণের কারণে তাঁদের গবেষণার সমাপ্তি দেখে যেতে পারেননি তিনি। আবদুল হাইয়ের গবেষকদের গবেষণার

বিষয় ও ক্ষেত্রের পরিসীমায় বড় জায়গাজুড়ে অবস্থান করে ভৌগোলিক দিক থেকে তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তান এবং ধর্মীয় পরিচয়ের দিক থেকে মুসলমান জনগোষ্ঠী। ১৯৭১ সালে পূর্ব-পাকিস্তানের নামটি পরিবর্তিত হয়ে বাংলাদেশ হলেও গবেষণা-ধারায় আমূল পরিবর্তন হয়নি; বরং রক্ষিত হয়েছে পরম্পরা। ফলে যেসব ধারণার সমন্বয়ে ও কার্যকারণগত অনিবার্যতায় প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ, অ্যাকাডেমিক অনুষঙ্গ যদি সেগুলোর একটি উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয়, তাহলে দেখা যাবে পাকিস্তান-ধারণা আর বাংলাদেশ-ধারণা সম্পূর্ণত বিরোধমূলক নয় – বরং অনেকটা পরম্পরাবাহিত; অন্তত মুহম্মদ আবদুল হাই পাঠপূর্বক এই মন্তব্য করা যায়।

৫. সাংস্কৃতিক ও সাংগঠনিক ক্রিয়াশীলতা

ষাটের দশকে আইয়ুবি সামরিক শাসনের কালে পূর্ব-পাকিস্তানে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মসূচি অর্জন করে রাজনৈতিক মাত্রা। এক রাষ্ট্রের দুই অংশের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য, সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য এবং সামরিক শাসনের ফলে অবরুদ্ধ রাজনৈতিক বাস্তবতা এই মাত্রা নির্মাণে ভূমিকা পালন করে। ১৯৬১ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শততম জন্মবার্ষিক আয়োজনকে কেন্দ্র করে সরকার ও বাংলাভাষী সচেতন বুদ্ধিজীবীমহল বিরোধমূলক অবস্থায় উপনীত হয়। মুহম্মদ আবদুল হাই ছিলেন রবীন্দ্রবিরোধী সরকারি অবস্থানের বিপক্ষে। সরকারি বিভিন্ন বাধাকে অতিক্রম করে পূর্ব-পাকিস্তানের একদল বুদ্ধিজীবীর তৎপরতায় ২৪শে মে থেকে ২৭শে মে পর্যন্ত ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয় রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিক আয়োজন। ২৫শে মে তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন মুহম্মদ আবদুল হাই। 'উদযাপন কমিটির প্রস্তুতিসভার কয়েকটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ হিসেবে তাঁর দপ্তরকক্ষেও।' (সাখাওয়াৎ ২০২৪ : ৩৭৭)। এটি কেবল রবীন্দ্র-অনুরাগের বিষয় নয়, বরং তৎকালীন সামূহিক রাষ্ট্রীয় বৈষম্যের বিরুদ্ধে নীতিগত অবস্থান। মুহম্মদ আবদুল হাই তাঁর বিচক্ষণতা ও সাহসিকতা দিয়ে সেই নৈতিক ভূমিকা পালন করেন।

মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের অ্যাকাডেমিক, সাংগঠনিক ও সাংস্কৃতিক ক্রিয়াশীলতার একটি সফল দৃষ্টান্ত ১৯৬৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে (২২-২৮) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগ কর্তৃক 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ' আয়োজন। বিভাগের তৎকালীন অধ্যক্ষ হিসেবে তিনি এই ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ আয়োজনে নেতৃত্বসূচক ভূমিকা পালন করেন। "ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ' সেকালের সাংস্কৃতিক জীবনে একটি সাড়া-জাগানো অনুষ্ঠান ছিল। প্রতিদিন হাজার হাজার লোক অকৃত্রিম কৌতূহল ও আগ্রহ নিয়ে প্রদর্শনী দেখেছে, আলোচনা শুনেছে এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপভোগ করেছে।' (সাঈদ-উর ২০০১ : ৮৩)। নিজ বিভাগের অভ্যন্তরে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিমণ্ডলে এবং প্রশাসনিক ও রাষ্ট্রীয়

পর্যায়ে নানা চাপ ও প্রতিকূলতা সত্ত্বেও আবদুল হাই এই আয়োজনটি সফলভাবে সম্পন্ন করতে পেরেছিলেন। 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ' নিছক অনুষ্ঠানমাত্র ছিল না। ওই আয়োজনে বক্তৃতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও প্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি কেবল অনুরাগই প্রকাশিত হয়নি, বরং পাকিস্তানের শিক্ষিত বাংলাভাষীদের মধ্যে আত্মপরিচয় সম্পর্কে একটা দৃশ্যমান সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায়। ওই আয়োজনের মধ্যে যে প্রতিবাদী চেতনা ক্রিয়াশীল ছিল, তার ভেতর থেকে শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে বাংলাভাষী জনতার বৃহত্তর গণ-আন্দোলনের ভবিষ্যৎ-ইঙ্গিত আবিষ্কার করা অসম্ভব নয়। একটি বিভাগের তথা অ্যাকাডেমিক অনুষ্ঠান হলেও এর আবেদন যে সামূহিক, তার পরিচয় পাওয়া যায় এর কর্মসূচি ও অনুষ্ঠান-পরিকল্পনায়। বিশেষত সভাপতি হিসেবে মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের ভাষণে ভাষণে তা স্পষ্টতর হয়ে ওঠে।

মুহম্মদ আবদুল হাই তাঁর বাংলা বিভাগকে অ্যাকাডেমিক দিক থেকে সমৃদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। সেগুলোর বেশ কিছু দৃষ্টান্তের কথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে। অ্যাকাডেমিকভাবে দক্ষ শিক্ষার্থীরা যাতে কর্মজীবনেও সফল হয়, এ বিষয়েও তাঁর সচেতন দৃষ্টি ছিল। ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহের সভাপতির ভাষণের মধ্যে অনেক বিষয়ের সঙ্গে এ বিষয়েরও অবতারণা করেছেন:

> বর্তমানে আমাদের [ঢাকা] ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের যাবতীয় শিক্ষকই এ বিভাগের ছাত্র। প্রদেশের স্কুল ও কলেজের অধিকাংশ বাংলা শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীও এ বিভাগে সরবরাহ করেছে। এ বিভাগের বহু কৃতী ছাত্র কলকাতা ও পশ্চিম বাংলার অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্য রক্ষা করে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষাদান করছেন। অদূর ভবিষ্যতে প্রদেশে যতই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হোক না কেন, তাদের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক সরবরাহের ভার থাকবে আমাদেরই বাংলা বিভাগের ওপর। (মুহম্মদ আবদুল ২০২০ : ৪৫)

একে শুধু অ্যাকাডেমিক নয়. অ্যাকাডেমি-নির্ভর প্রশাসনিক তৎপরতা হিসেবেও দেখা যেতে পারে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে তাঁর আরও কিছু পরিকল্পনা ছিল, যা ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহের ভাষণে প্রকাশিত হয়েছে। সেগুলোর একটি হলো – 'সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক পটভূমিকায় বিজ্ঞান-ভিত্তিক পদ্ধতিতে আমাদের সাহিত্যের যথার্থ মূল্যমান বিচার করে বাংলা সাহিত্যের একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার এখন সময় এসেছে। এই উদ্দেশ্যে *Cambridge History of English Literature*-এর মতো কয়েক খণ্ডে বাংলা সাহিত্যের একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত করেছি।' ... এবং 'আমাদের দ্বিতীয় বৃহৎ পরিকল্পনা পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন উপভাষার বিজ্ঞান-ভিত্তিক জরিপ-সাধন।' (মুহম্মদ আবদুল ২০২০ : ৪৩-৪৪)।

প্রথম পরিকল্পনাটি পূর্ণাঙ্গরূপে এখনও বাস্তবায়িত হয়নি। তবে এই প্রস্তাবের আগেই (১৯৫৬) প্রকাশিত *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত* বইয়ে তার সূচনা আছে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস তখনই পূর্ণাঙ্গতা পেতে পারে, যখন সেখানে যথাযথভাবে যুক্ত হবে 'বাংলাদেশের সাহিত্যের ইতিহাস'। দ্বিতীয় পরিকল্পনাটিও বাস্তবায়িত হয়নি। তবে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র সম্পাদনায় বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত *পূর্ব পাকিস্তানী আঞ্চলিক ভাষার অভিধান* (১৯৬৫) – যার বর্তমান নাম *বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান* – তাঁর চিন্তা দ্বারা অনুপ্রাণিত। এছাড়া বিদেশিদের বাংলা শেখানোর জন্য *Bengali Language Handbook* (১৯৬৬) কিংবা স্কুলপাঠ্য *প্রাথমিক বাংলা ব্যাকরণ* (১৯৬৭) রচনা – এসবও তাঁর সামূহিক অ্যাকাডেমিক তৎপরতার অংশ। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতিকে সামনে রেখে যেমন তিনি এসব তৎপরতাকে অব্যাহত রেখেছেন, একই সঙ্গে পাকিস্তান রাষ্ট্রে যাতে অপরাপর জনগোষ্ঠীর চেয়ে বাংলাভাষী জনগোষ্ঠী তাদের স্বীয় সংকট কিংবা রাষ্ট্রের সঙ্গে সংকটগুলো মোকাবিলা করে অপেক্ষাকৃত উন্নত জীবনের অধিকারী হতে পারে তিনি সে বিষয়েও সচেতন ছিলেন। পাকিস্তান-পর্বে পাকিস্তানধারণা-সাপেক্ষ এই কর্মতৎপরতায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অ্যাকাডেমিক কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে মূলত বাংলাভাষী জনগোষ্ঠীর কল্যাণে আবদুল হাইয়ের নিবেদনকে শনাক্ত করা যায়।

৬. পাকিস্তান-ধারণা ও বাংলাদেশ-ধারণা

মুহম্মদ আবদুল হাই এবং সৈয়দ আলী আহসানের যৌথ রচনায় প্রকাশিত হয় *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (আধুনিক যুগ)*। এই বইয়ে বাংলা সাহিত্যের মুসলমান লেখকরা অনেকখানি জায়গা পেয়ে যান, যাঁরা ছিলেন 'অখণ্ড বাংলা সাহিত্যে'র ইতিহাসে কম আলোচিত অথবা অনালোচিত। বইটি লেখা হয়েছিল 'পাকিস্তান সরকারের শিক্ষামন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা অনুযায়ী' (হুমায়ুন ১৯৯৪/১ : আট)। এই বইয়ের একটি অধ্যায় (পঞ্চম পরিচ্ছেদ) 'ইসলামী সাহিত্য'। স্বাভাবিক বিচারে সাহিত্যে ওইসব মুসলমান লেখকের অবদান ও কৃতিত্ব-অনুপাতে বেশি জায়গা পাওয়ার বিষয়টি ভারসাম্যের অভাব বলে মনে হতে পারে। তবে এখানে বাংলা সাহিত্যের অপূর্ণাঙ্গতার দায় মোচনের চেষ্টা আছে। 'এই গ্রন্থে সর্বপ্রথম হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে অখণ্ড বাঙালি জাতির সাহিত্যকৃতির পরিচয় লিপিবদ্ধ করার প্রচেষ্টা ব্যক্ত হয়েছে।' (খোন্দকার সিরাজুল ২০০০ : ৩৭২)। দেখা যায় 'রবীন্দ্র যুগ' পরিচ্ছেদে স্থান পায় 'একজন ব্রাহ্ম [রবীন্দ্রনাথ], পাঁচজন হিন্দু, তেতাল্লিশ জন মুসলমান এবং একটি প্রগতিশীল সাহিত্য-গোষ্ঠী' (আলম ২০২৪ : ৩১৫)। আবদুল হাইয়ের সম্পাদনায় *সাহিত্য পত্রিকায়* ওই বইয়ের যে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়, তাতেও উল্লেখ করা থাকে: 'আধুনিক যুগের মুসলিম-লেখকদের সাহিত্য-সাধনা সম্পর্কিত একমাত্র নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ।' (মুহম্মদ আবদুল ১৩৬৫)। মুহম্মদ

*আবদুল হাই রচনাবলী*র সম্পাদক হুমায়ুন আজাদ (১৯৯৪/২ : ছয়) মুসলমান লেখকদের এই আধিক্যের বিষয় সম্পর্কে লেখেন: 'মুহম্মদ আবদুল হাই বাঙলা সাহিত্যের পাকিস্তানি ইতিহাস না লিখে লেখেন প্রধানত মুসলমান লেখকদের ইতিহাস।' হুমায়ুন আজাদের ব্যাখ্যা পড়ে এই ধারণা জন্মানো অসম্ভব নয় যে, বাংলা সাহিত্যের পাকিস্তানি ইতিহাস লেখা প্রশংসনীয় নয়; মুসলমানের ইতিহাস লেখা কম নিন্দনীয়। কিন্তু এ কথা অস্বীকার করাবার উপায় নেই যে, পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত না হলে বাদ পড়া বা কম আলোচিত মুসলমান লেখকরা কোনোভাবেই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্থান পেতেন না। তাই বাংলা সাহিত্যের পাকিস্তানি ইতিহাস আর মুসলমান লেখকদের ইতিহাস লেখাকে আলাদা করে আবদুল হাইকে 'বাঁচানো'র সুযোগ থাকে না। আবদুল হাই হয়তো এভাবে 'বাঁচার' প্রত্যাশাও করেননি। কারণ তিনি সময়-রাষ্ট্র-পরিস্থিতির সাপেক্ষেই অ্যাকাডেমিক কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাই দেখা যায় রবীন্দ্রসাহিত্য পাঠদান, রবীন্দ্রসংগীতের প্রতি অনুরাগ, রবীন্দ্র-জন্মবার্ষিক আয়োজনের সঙ্গে তাঁর পাকিস্তান-ধারণার কোনো সংঘর্ষ বাঁধে না। কারণ আবদুল হাইয়ের পাকিস্তান-চিন্তার ভেতরেই সদর্থকভাবে অবস্থান করে তাঁর রবীন্দ্র-অভিজ্ঞান। তিনি যখন পাঠ্যপুস্তক হিসেবে লেখেন 'পূর্ব পাকিস্তান আমার দেশ' (*সাহিত্যের পথে*, ১৯৫৭), তখনও পাকিস্তানের অন্য প্রদেশ নয়; তাঁর নিজের প্রদেশের ভূগোল-আবহাওয়া-প্রকৃতিই প্রাধান্য লাভ করে। তিনি লেখেন:

> পূর্ব পাকিস্তান আমার দেশ। আমি এই দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। এই দেশের আবহাওয়ায় মানুষ হইতেছি। এই দেশের মাটিতে যে শাক-সব্জী, ফল-মূল এবং আরও নানা প্রকার খাদ্যশস্য জন্মে, তাহা খাইয়াই আমি জীবনধারণ করিতেছি। ... ধন্য আমার মাতৃভূমি, ধন্য আমার পূর্ব-পাকিস্তান, তোমাকে আমার সালাম জানাই। (মুহম্মদ আবদুল ১৯৯৪/৩ : ৪৭৪-৪৭৫)

এখানে তাঁর ভৌগোলিক চিন্তায় 'পাকিস্তান-ধারণা'র মধ্যে স্বাভাবিকভাবে 'বাংলাদেশের-ধারণা' অবস্থান করে। রাষ্ট্র-পাকিস্তানের চেয়েও এখানে 'ধারণা-পাকিস্তান' গুরুত্ব পায়। তাঁর পাকিস্তান-ধারণা এবং বাংলাদেশ-ধারণা অনেকখানি সমীপবর্তী।

মুহম্মদ আবদুল হাই পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকাররের অর্থে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বিভিন্ন ধরনের অ্যাকাডেমিক কাজের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। ওই সময়ে প্রশ্ন উত্থাপিত না হলেও পরবর্তী সময়ে প্রশ্ন উঠেছে যে, তিনি কেন সরকারি টাকায় এই ধরনের কাজে যুক্ত ছিলেন? একাত্তর-পরবর্তী বাংলাদেশের 'বাঙালি জাতীয়তাবাদী' লেন্স দিয়ে দেখলে তখনকার অনেক বিষয়কে বিরোধমূলকও মনে হতে পারে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় *ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ ১৩৭০*-এর কথা। ১৯৬৩ সালে অনুষ্ঠিত 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ' সম্পন্ন হওয়ার পর অনুষ্ঠানের বিষয়বস্তু, অনুষ্ঠানসূচি, তিনটি প্রধান বক্তৃতাসহ অন্যান্য বক্তৃতা, আলোচকদের অভিমত, মন্তব্যের খাতা ও পত্রিকার পাতা থেকে বাছাই করা কিছু বক্তব্য নিয়ে প্রকাশিত হয় *ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ ১৩৭০* (১৯৬৪) শিরোনামে

এই সংকলনগ্রন্থ। সংকলনগ্রন্থের ভূমিকা থেকে জানা যায় – উক্ত ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহের মূল আয়োজক ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ; আয়োজনের যাবতীয় ব্যয়ভার নির্বাহ করেছিল পাকিস্তান জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থা (বিএনআর) এবং কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড। পরবর্তী বছর গ্রন্থটি মুদ্রণ করার ক্ষেত্রেও তৎকালীন কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করে। ওই সময়ের সক্রিয় সংস্কৃতিকর্মী ও পরবর্তীকালে বাংলা বিভাগের শিক্ষক সন্‌জীদা খাতুন (২০২১ : ৩৪) বিএনআর থেকে অর্থ-সহায়তা গ্রহণের বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেন:

> পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় উদ্যোগগুলো বাঙালিকে 'পাকিস্তানি মুসলমান' হিসেবে গড়ে তোলার প্রয়াসে নিয়োজিত ছিল। সেই উদ্দেশ্যে গঠিত হয়েছিল 'ব্যুরো অব ন্যাশনাল রিকনস্ট্রাকশন' [বিএনআর]। ভাষা-সাহিত্য সপ্তাহের উদ্যোক্তারা 'ন্যাশনাল রিকনস্ট্রাকশন' বিষয়ে জেনে বুঝেই অর্থ সহায়তা নিয়েছিলেন তো?

আবার, 'আধুনিক মনে ভাষা ও ভাবধারায় এছলামের আদর্শ' প্রচারের লক্ষ্য নিয়ে তৎকালীন সামরিক প্রধান ও প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান লেখক সঙ্ঘকে (১৯৫৯) একাত্তর-পরবর্তীকালে ভালো চোখে বিবেচনা করা হয়নি। বরং পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত সুবিধাবাদী লেখকগোষ্ঠী তৈরির একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে একে বিবেচনা করা হয়। মোরশেদ শফিউল হাসান (২০১৮ : ১৪৭) জানান:

> সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পাকিস্তানি আদর্শ বা ভাবধারার প্রতিফলন ও বিকাশ ঘটানোর বক্তব্যের আড়ালে পাকিস্তান লেখক সংঘ গঠনের উদ্দেশ্য ছিল আসলে সামরিক শাসনের পক্ষে লেখকদের সমর্থন আদায়, অন্তত তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সম্ভাবনা রোধ করা। লেখকদের নানা কর্মসূচিতে ব্যস্ত রেখে ও তাদের সামনে সুযোগসুবিধার টোপ ঝুলিয়ে তারা এই উদ্দেশ্য অর্জন করতে চেয়েছিল।

সমগ্র পাকিস্তানের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে পূর্ব-পাকিস্তানের গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল। পাকিস্তান-পর্বের অর্থনীতি নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেছেন[৭], তাঁদের গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা যায় – যে টাকায় পাকিস্তানের সরকার পরিচালিত হতো, সেখানে পূর্ব-পাকিস্তানের ভূমিকার অনুপাত বেশি বৈ কম ছিল না। যদিও উন্নয়ন-বরাদ্দ হিসেবে খুব কম অর্থই পূর্ব-পাকিস্তানের ভাগ্যে জোটে। সে-বিবেচনায় প্রতিষ্ঠানগত উন্নতির জন্য সরকারি টাকা নেওয়ার অর্থ নিজের জনাঞ্চলেরই টাকা নেওয়া। তাই পাকিস্তান-পর্বে পূর্ব অংশে সরকারি অর্থায়নে বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠা (১৯৫৫) বা কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠা (১৯৬২) মূলত নিজেদের অর্থে নিজেদের প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা। এতে নৈতিকতার প্রশ্নে কোনো বিরোধ তৈরি হয় না। একইভাবে পাকিস্তানের সরকারি টাকায় মুহম্মদ আবদুল হাই যে *সাহিত্য পত্রিকা* প্রকাশ করেন বা ভাষা-সাহিত্য সপ্তাহের আয়োজন করেন, তাকেও স্ব-অর্থায়নে নিজেদের ভাষা-সাহিত্যের গবেষণা ও চর্চা হিসেবে বিবেচনা করা যায়। দেখার বিষয় এই অর্থ গ্রহণ করে যে কাজটি হচ্ছে তা জনবিরোধী কিনা, স্বজাতি ও স্বসমাজের বিরুদ্ধে কিনা, বৈষম্যমূলক কিনা। ওই কালে এবং পরবর্তীকালেও এটি নিয়ে অন্তত কোনো প্রশ্ন উত্থাপিত হয়নি যে, বাংলা ভাষা ও

সাহিত্যের বিকাশ ও সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের তৎপরতা জনবিরোধী ছিল। বরং সরকারি অর্থ গ্রহণ করেও তিনি যে কাজগুলো করেছেন সাহসিকতার সঙ্গে, তা বৃহত্তর শোষণবিরোধী ও বৈষম্যবিরোধী এবং শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অনিবার্য উপাদান হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। ফলে পাকিস্তান রাষ্ট্রের আভ্যন্তর পরিকাঠামোর ভেতরে অবস্থান করেও আবদুল হাই বাস্তব কার্যকারণের ভিত্তিতে যে অ্যাকাডেমিক কাজগুলো করেছেন, তা বাংলাদেশ সৃষ্টির উপাদানসমষ্টির গুরুত্বপূর্ণ অংশে পরিণত হয়েছে। এদিক থেকে তাঁর পাকিস্তান ধারণা ও ভবিষ্যতের বাংলাদেশ ধারণার মধ্যে কোনো বিরোধ তৈরি হয়নি।

উপমহাদেশে ১৯৪৭ সালের পর প্রথম রাষ্ট্র-ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হয় বাংলা-জনাঞ্চলবাসী। আর পাকিস্তান রাষ্ট্রে শুরু থেকে যেসব আন্দোলন-সংগ্রাম সংঘটিত হয়েছে, তা রাষ্ট্রশাসক ও শোষিত জনতার মধ্যকার শ্রেণিগত দ্বন্দ্বের সূত্র ধরে সংঘটিত হয়েছে; রাষ্ট্রকে অস্বীকার করে নয়। ফলে পাকিস্তান রাষ্ট্রের পূর্ববাংলা অংশে ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ছোট-বড় সকল লড়াইয়ে জনমানুষের অবস্থান মূলত অন্যায়ের বিরুদ্ধে তার স্বভাবজাত সংগ্রামশীল অবস্থান। রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে, বর্ণসংস্কার প্রশ্নে তাই মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের অবস্থান তাঁর জনাঞ্চলের অবস্থান থেকে ভিন্ন নয়। ভাষাতাত্ত্বিক হিসেবে তিনি ভাষার সংস্কারকে যেমন সমর্থন করেছেন, তেমনি রাষ্ট্রকর্তৃক আরোপিত ও চাপানো যে-কোনো তৎপরতার বিরোধিতা করেছেন, যার অন্যতম দৃষ্টান্ত এই যে, তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ণমালা ও বানান সংস্কার কমিটির সদস্য হিসেবে যেমন থেকেছেন, তেমনি অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তের প্রতিবাদও করেছেন। এ অবস্থানকে বিবেচনা করা যায় 'খাঁটি লিবারেল দৃষ্টিভঙ্গির ফসল' হিসেবে। 'আর এ অবস্থান খুব জোরালোভাবে এক নিপীড়ক রাষ্ট্রযন্ত্রকে চিহ্নিত করে, যে রাষ্ট্র জনগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতিকে সুষ্ঠুভাবে বিকশিত হতে না দিয়ে আরোপিত ছাঁচে বেঁধে ফেলতে চায়।' (মোহাম্মদ আজম ২০২১ : ১২৬)। মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের এই লড়াইয়ের ধরন যে-কোনো সময়পর্বের যে-কোনো রাষ্ট্রব্যবস্থায় নিপীড়ক রাষ্ট্রযন্ত্রের বিরুদ্ধে জনমানুষের অবস্থানের যৌক্তিকতাকে স্পষ্টতর করে।

৭. উপসংহার

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের কর্মস্থল কৃষ্ণনগর ভারত রাষ্ট্রভুক্ত হওয়ায় এবং রাষ্ট্র বাছাইয়ের সুযোগ থাকায় তিনি 'অপশন' নিয়ে (১১ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৭) পাকিস্তানে (রাজশাহী) চলে আসেন (আজহারউদ্দীন ১৯৭৬ : ৭)। তিনি লিখেছেন *ইসলামের ঐতিহাসিক অবদান* শীর্ষক অনুবাদগ্রন্থ, ইসলাম ও মুসলমান-সংক্রান্ত একাধিক প্রবন্ধ[৮], 'যুগস্রষ্টা জিন্নাহ' (*তোষামোদ ও রাজনীতির ভাষা*, ১৯৫৯) বা 'পাকিস্তানের জাতীয় কবি ইকবাল' (*ভাষা ও সাহিত্য*, ১৯৬০)-এর মতো প্রবন্ধ। *The Historical Role of Islam* বইয়ের অনুবাদের পর মুহম্মদ আবদুল হাই ইসলামি সাহিত্য নিয়ে অনুবাদমূলক আরও কিছু কাজ করতে চেয়েছিলেন। তাঁর অ্যাকাডেমিক চর্চাও যে পাকিস্তানি জাতীয় চেতনার সঙ্গে যুক্ত, এ বিষয়টিও অপ্রকাশ্য রাখেননি।

আজহারউদ্দীন খানকে এক চিঠিতে (০৯.০৭.১৯৫০) তিনি জানান: 'বিশ্ববিদ্যালয়ের ও পাকিস্তানের জাতীয় প্রয়োজনে এবং আমারও বহুদিনের স্বপ্ন সফল হবে ভেবে সম্প্রতি 'ভাষাতত্ত্ব' নিয়ে গবেষণা করবার জন্য সাগর পাড়ি দিচ্ছি।' (উদ্ধৃত, আজহারউদ্দীন ১৯৭৬ : ২)। – এই ঘটনাসমষ্টি থেকে তাঁকে 'পাকিস্তানবাদী' হিসেবে চিহ্নিত করা এবং অন্যদিকে *সাহিত্য পত্রিকা* প্রকাশের মধ্য দিয়ে বাংলা বিদ্যাচর্চার উন্নতি সাধনের চেষ্টা, রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপনে সক্রিয় অংশগ্রহণ, ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহের আয়োজন, রোমান হরফে বাংলা লেখার উদ্যোগের বিরোধিতা প্রভৃতি দিয়ে খাঁটি বাঙালি জাতীয়তাবাদী হিসেবে প্রতিপন্ন করা – এই দুয়ের মধ্যে আছে কালের বাস্তবতাকে অস্বীকার করে একটা সরল সমীকরণ তৈরি করার প্রবণতা। এই সরল সমীকরণে অপেক্ষাকৃত কম আয়াসে দেখানো যায়, কীভাবে একজন পাকিস্তানের সমর্থক সাতচল্লিশ-পরবর্তীকালে – বিশেষত বায়ান্নর পর – আর পাকিস্তান-ধারণার মধ্যে থাকে না; রূপান্তরিত হয় বাঙালি জাতীয়তাবাদীতে। কিন্তু অপরাপর বাস্তবতা ও সময়ের মতো আবদুল হাইয়ের বাস্তবতাও সরল ছিল না; ছিল না একমাত্রিক। বহুমাত্রার মিথস্ক্রিয়ায় তাঁর এবং তাঁর কালের যে অভিযাত্রারেখা তৈরি হয়, তা বিশেষ মতবাদ-সাপেক্ষ নয়। একটি সময়-পর্বে জনমানুষের অধিকার-প্রশ্নে একগুচ্ছ ধারণার সমষ্টিকে চিহ্নিত করা যায় – যার নাম থাকে 'পাকিস্তান-ধারণা', পরম্পরাবাহিত হয়ে ওই জনমানুষের অধিকার আদায়ের আন্দোলনের সাপেক্ষে তা-ই 'বাংলাদেশ-ধারণা'য় রূপলাভ করে। এদের মধ্যে বিরোধ বা সমন্বয় আবিষ্কারের চেয়েও দুইয়ের অন্তরঙ্গতা উপলব্ধি করা যায়।

মুহম্মদ আবদুল হাই প্রধানত একজন অ্যাকাডেমিক ব্যক্তিত্ব। অ্যাকাডেমিক অবস্থান থেকে তিনি তাঁর প্রধান কাজগুলো সম্পন্ন করেছেন। ঐতিহাসিক পরম্পরার ভেতর দিয়ে তিনি যেমন পাকিস্তান-ধারণার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তেমনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সংগ্রামী অভিযাত্রায় তাঁর যুক্ততাও ইতিহাসের পরম্পরাবাহিত। বাংলাদেশ-পর্বের বাস্তবতায় আবদুল হাইয়ের ভূমিকা গৃহীত হয়েছে গভীরতর রাজনৈতিক চেতনার অনুষঙ্গে। কিন্তু তিনি কোনো একক মতবাদ-তাড়িত হয়ে তাঁর সক্রিয়তা ও তৎপরতাকে অব্যাহত রাখেননি। মুহম্মদ আবদুল হাই কার্যকারণের ভিত্তিতে একজন বাস্তববাদী ও দায়বদ্ধ ব্যক্তিত্ব হিসেবে পাকিস্তান বা বাংলাদেশ ধারণার মেরুকরণ থেকে মুক্ত থেকে নিজ পরিসরে অ্যাকাডেমিক কর্মসৃজনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের বিদ্যাচর্চার ইতিহাসে সমুজ্জ্বল হয়ে থাকেন।

টীকা

১. মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের পূর্ণনাম আবুল বশার মুহম্মদ আবদুল হাই; যদিও অ্যাকাডেমিক পরিসরে তিনি আবুল বশার অংশটি ব্যবহার করেননি। মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের জন্ম মুর্শিদাবাদ জেলার রাণীনগর থানার মরীচা গ্রামে ১৯১৯ সালের ২৬শে নভেম্বর। যদিও প্রবেশিকা পরীক্ষার সার্টিফিকেটে তাঁর জন্মতারিখ ২রা মার্চ ১৯১৯। আবদুল হাই ছিলেন মুর্শিদাবাদের বিখ্যাত পির হযরত শাহ চাঁদের বংশধর। ১৯৩৬ সালে তিনি রাজশাহী হাই মাদ্রাসা থেকে প্রবেশিকা

(এসএসসি) পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পঞ্চম স্থান অধিকার করেন; ১৯৩৮ সালে ঢাকার ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ [বর্তমানে কবি নজরুল সরকারি কলেজ] থেকে প্রথম বিভাগে ষষ্ঠ স্থান অধিকার করে আই.এ. (এইচএসসি) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে বিএ অনার্স পরীক্ষায় (১৯৪১) প্রথম শ্রেণিতে দ্বিতীয় এবং এমএ পরীক্ষায় (১৯৪২) প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের কর্মজীবন শুরু হয় ঢাকার ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজে শিক্ষকতা দিয়ে। এরপর ঢাকা সরকারি কলেজ, চট্টগ্রাম কলেজ, কৃষ্ণনগর কলেজ এবং ১৯৪৭ সালের পর রাজশাহী কলেজে বাংলা বিষয়ে তিনি শিক্ষকতা করেন। ১৯৪৯ সালের ২রা মার্চ তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগে লেকচারার হিসেবে যোগ দেন। মুহম্মদ আবদুল হাই ১৯৫০ সালে ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে উচ্চতর অধ্যয়নের জন্য ইংল্যান্ড (বিলেত) গমন করেন এবং ১৯৫৩ সালে ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব বিষয়ে ডিস্টিংসহ এমএ পাশ করে ঢাকায় ফেরেন। ১৯৫৪ সালে তিনি বাংলা বিভাগের রিডার (সহযোগী অধ্যাপক) পদে উন্নীত হন এবং অধ্যক্ষের (বিভাগীয় প্রধান) দায়িত্ব লাভ করেন। মুহম্মদ আবদুল হাই ১৯৬২ সালে প্রফেসর হন। ১৯৬৮ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের ডিন নির্বাচিত হন। ১৯৬৯ সালের ৩ জুন ঢাকার খিলগাঁও এলাকায় রেলদুর্ঘটনায় তাঁর অকাল প্রয়াণ ঘটে। (আজহারউদ্দীন ১৯৭৬; মনসুর মুসা ২০২৩)

২. ১৯৪৭ থেকে ১৯৫২ – এই সময়পর্বের পাকিস্তান রাষ্ট্রের নতুন ধারার বাংলা সাহিত্য রচয়িতাদের যেসব সমালোচক 'পাকিস্তানবাদী সাহিত্যিক' হিসেবে অভিহিত করেন, হুমায়ুন আজাদ তাঁদের অগ্রভাগে থাকবেন। (দ্রষ্টব্য: হুমায়ুন ২০১৪)

৩. *সাহিত্য পত্রিকা*র প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যায় 'কৃতজ্ঞতা স্বীকার' অংশে মুহম্মদ আবদুল হাই উল্লেখ করেন:

> ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে এ ধরনের পত্রিকা প্রকাশের এটিই প্রথম উদ্যম। আর্থিক সঙ্গতির অভাববশত অতীতে শুধু পত্রিকা কেন, এখানকার কোন গবেষণার ফলই প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। কিছুদিন পূর্বে এ বিভাগের বিবিধ অভাব অভিযোগ সম্পর্কে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব জহিরুদ্দীনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। তিনি উদ্যোগী হ'য়ে পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর জন্যে এ বিভাগকে উল্লেখযোগ্য অর্থ সাহায্য করেন:
>
> (১) বাংলা বিভাগের সেমিনার গ্রন্থাগারের সমৃদ্ধিসাধন
>
> (২) বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সংক্রান্ত বিষয়ে গবেষণা করার জন্যে উপযুক্ত প্রার্থীকে বৃত্তিদান
>
> (৩) পত্রিকা প্রকাশ এবং
>
> (৪) গবেষণা প্রকাশের ব্যবস্থা।
>
> উক্ত পরিকল্পনা অনুসারে এ পত্রিকা প্রকাশ করা হলো। অনতিবিলম্বে মরহুম

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ কৃত মধ্যযুগের বাংলা পুঁথি সাহিত্যের বিস্তৃত বিবরণও প্রকাশিত হচ্ছে। এ ছাড়া কবি নজরুল ইসলামের জীবনী ও সাহিত্য বিষয়ে গবেষণা করার জন্যে এ বিভাগের একজন কৃতী ছাত্রকে বৃত্তি দান করা হয়েছে এবং বিভাগীয় সেমিনার গ্রন্থাগারেরও যথেষ্ট উন্নতি সাধন করা হয়েছে।

আমার আবেদনক্রমে পাকিস্তানের শিক্ষামন্ত্রী জনাব জহিরুদ্দীন বাংলা ভাষাও সাহিত্যের উন্নতিবিধানের জন্যে এ ভাবে অর্থসাহায্য করার ব্যবস্থা ক'রে এ ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত দরদ ও অকুণ্ঠ অনুরাগ প্রকাশ করেছেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার জনাব মুহম্মদ ইবরাহিম আমাদের পরিকল্পনা অনুমোদন করে আমাকে কাজ করার সুযোগ দিয়েছেন। সে জন্যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সেবক এবং বিভাগীয় শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের পক্ষ থেকে এই দুই মনীষীর প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। (মুহম্মদ আবদুল হাই ১৩৬৪)

৪. মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের সম্পাদনায় *সাহিত্য পত্রিকায়* প্রকাশিত প্রবন্ধের তালিকার জন্য দ্রষ্টব্য: *সাহিত্য পত্রিকা* (১৯৯৫), বর্ষ ৩৮ সংখ্যা ৩, সম্পাদক: রফিকুল ইসলাম, DOI: https://doi.org/10.62328/sp.v38i3

৫. প্রায় একই ধরনের চিন্তার উপস্থিতি লক্ষ করা যায় মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের (১৯৯৪/১ : ৪৯৪) উচ্চারণে:

> পাকিস্তান ইসলামিক রাষ্ট্র হোক বা না হোক পাকিস্তানের অধিকাংশ অধিবাসীই যখন মুসলমান তখন তার জীবনে এবং সাহিত্যেও ইসলামের সুস্পষ্ট ছাপ থাকতে বাধ্য। ইসলাম শুধু ধর্ম নয়; দুনিয়াতে মানুষের সুস্থ, সবল, স্বাভাবিক ও সহজভাবে বেঁচে থাকবার ব্যবহার বিধি। উক্ত নীতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি জড়িত থেকে যে জাত বাঁচতে চায় তার উপযোগী সাহিত্য তাকে তৈরী করতে হবে। ('আমাদের ভাষা ও সাহিত্য', *সাহিত্য ও সংস্কৃতি*)

'ইসলামের বৈপ্লবিক ভূমিকা' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন (১৯৯৪/১ : ৫১০): 'পাকিস্তান থেকে ইসলামের বিলম্বিত রেনেসাঁর শুরু হোক! যুদ্ধ-জর্জরিত পৃথিবীতে মজলুম মানবতা ইসলামের আদি স্বরূপে অবগাহন করে শান্ত হয়ে উঠুক।' (*মাহেনও*, নভেম্বর, ১৯৫০)

৬. মুহম্মদ আবদুল হাইয়ে তত্ত্বাবধানে পিএইচডি গবেষণা (গবেষক ও শিরোনাম):

নীলিমা ইব্রাহিম : 'সামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমিকায় ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা নাটক' (১৯৫৯)

এ. টি. এম. আনিসুজ্জামান : 'ইংরেজ আমলের বাংলা সাহিত্যে বাংগালী মুসলমানের চিন্তাধারা (১৭৫৭-১৯১৮)' (১৯৬২)

গোলাম সাকলায়েন : 'বাংলায় মর্সীয়া সাহিত্য' (১৯৬২)

আহমদ শরীফ : 'সৈয়দ সুলতান : তাঁর কর্ম ও সময়' (১৯৬৭)

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান : 'আধুনিক বাংলা কাব্যে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক (১৮৫৭-১৯২০)' (১৯৬৯)

৭. পাকিস্তান-পর্বে পাকিস্তানের দুই অংশের অর্থনৈতিক অবদান ও ভূমিকা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করেছেন রওনক জাহান। (দ্রষ্টব্যঃ Rounaq 2023)

৮. ইসলাম ও মুসলমান-সংক্রান্ত মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধঃ
'বাংলা দেশে মুসলিম অধিকারের যুগ ও বাংলা সাহিত্য'
'ইসলামের বৈপ্লবিক ভূমিকা'
'ইসলামের শাসন সংহতি'
'মুসলিম ভারতে শিক্ষা ব্যবস্থা'
'মুসলিম ভারতে স্ত্রী শিক্ষা'

তথ্যনির্দেশ

আজহারউদ্দীন খান্ (১৯৭৬)। *বাংলা সাহিত্যে মুহম্মদ আবদুল হাই*। বর্ণ মিছিল, ঢাকা

আবুল মনসুর আহমদ (১৩৪৯)। 'সাহিত্যে সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য'। *মাসিক মোহাম্মদী*, সম্পাদকঃ মোহাম্মদ আকরম খাঁ, ষোড়শ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, কলকাতা

আলম সাইফুল (২০২৪)। 'ভিন্ন নিরীক্ষায় মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের 'রবীন্দ্রযুগ''। *ভেঙেছ দুয়ার এসেছ জ্যোতির্ময় : মুহম্মদ আবদুল হাই জন্মশতবার্ষিক স্মারকগ্রন্থ*, সম্পাদকঃ সাখাওয়াৎ আনসারী, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

খোন্দকার সিরাজুল হক (২০০০)। 'মুহম্মদ আবদুল হাই : তাঁর সংস্কৃতি সাধনা'। *মুহম্মদ আবদুল হাই স্মারকগ্রন্থ*, সম্পাদকঃ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা

মনসুর মুসা (২০২৩)। 'মুহম্মদ আবদুল হাই'। *স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব*, পরিবর্ধিত সংস্করণ সম্পাদকঃ সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ, ভীষ্মদেব চৌধুরী, সৈয়দ আজিজুল হক, বাংলা বিভাগ ও বাংলা অ্যালামনাই, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

মুহম্মদ আবদুল হাই [সম্পাদিত] (১৩৬৪)। *সাহিত্য পত্রিকা*। প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা, বর্ষা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগ, ঢাকা

মুহম্মদ আবদুল হাই [সম্পাদিত] (১৩৬৫)। *সাহিত্য পত্রিকা*। দ্বিতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যা, বর্ষা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগ, ঢাকা

মুহম্মদ আবদুল হাই (১৯৯৪)। *মুহম্মদ আবদুল হাই রচনাবলী* (১, ২, ৩)। সম্পাদকঃ হুমায়ুন আজাদ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

মুহম্মদ আবদুল হাই (২০২০)। 'ভাষণ'। *ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ ১৩৭০ : বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*, সম্পাদকঃ মুহম্মদ আবদুল হাই, জাগৃতি প্রকাশনী, ঢাকা

মোরশেদ শফিউল হাসান (২০১৮)। *স্বাধীনতার পটভূমি : ১৯৬০ দশক*। তৃতীয় সংস্করণ, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা

মোহাম্মদ আজম (২০২১)। 'বাংলাদেশে বাংলা ভাষার প্রমিতায়ন ও মুহম্মদ আবদুল হাই : সাংস্কৃতিক রাজনীতির নিরিখে'। *প্রাচ্যবিদ্যা পত্রিকা*, সম্পাদকঃ মালবিকা বিশ্বাস, বিশেষ সংখ্যা ২০২১, সংস্কৃত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

মোহাম্মদ আজম (২০২২)। *সাংস্কৃতিক রাজনীতি ও বাংলাদেশ*। সংহতি, ঢাকা

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান [সম্পাদিত] (২০০০) । *মুহম্মদ আবদুল হাই স্মারকগ্রন্থ*। এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা

মো. রাফাত আলম মিশু (২০২৩)। 'রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন : সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক ক্রিয়াশীলতার অনুষঙ্গে'। *সাহিত্য পত্রিকা*, বর্ষ ৫৮ সংখ্যা ১-২, সম্পাদক: সৈয়দ আজিজুল হক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

রাফাত মিশু (২০২১)। *শতবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ : উচ্চতর গবেষণার রূপরেখা*। মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা

সন্‌জীদা খাতুন (২০২১)। *সাংস্কৃতিক মুক্তিসংগ্রাম*। সংকলন ও গ্রন্থনা: পিয়াস মজিদ, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা

সাঈদ-উর রহমান (২০০১)। *পূর্ব বাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা*। দ্বিতীয় সংস্করণ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা

সাখাওয়াৎ আনসারী [সম্পাদিত] (২০২৪)। *ভেঙেছ দুয়ার এসেছ জ্যোতির্ময় : মুহম্মদ আবদুল হাই জন্মশতবার্ষিক স্মারকগ্রন্থ*। ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

হুমায়ুন আজাদ [সম্পাদিত] (১৯৯৪)। 'অবতরণিকা'। *মুহম্মদ আবদুল হাই রচনাবলী* (১, ২, ৩), বাংলা একাডেমী, ঢাকা

হুমায়ুন আজাদ (২০১৪)। *ভাষা-আন্দোলন : সাহিত্যিক পটভূমি*। আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

Rounaq Jahan (2023). *Pakistan: failure in national integration*. Sixth impression, University Press Limited, Dhaka.